‘বিন্দু থেকে বৃত্তে’ পৌর সমাজের দহনকথা

তপোধীর ভট্টাচার্য

মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠার এই উপন্যাস। শুতেই ‘ নেপথ্যের কিছু কথা’য় ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘আমার ক্ষুদ্র আয়তনের এই উপন্যাসটির পেছনে কিছু ইতিহাস আছে। মেধা পাটেকার বা সুন্দরলাল পাটোয়ার মতো পরিবেশ আন্দোলনকারী কর্মকান্ড সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবহিত। কিন্তু নামগোত্রহীন অসংখ্য ব্যক্তি যখন বাসস্থানের চারপাশে কোনও পরিবেশ-অসংগতি নিয়ে প্রতিবাদে নামেন তাঁদের লড়াই কিন্তু ভীষণ কঠিন ও নির্মম। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে তেমনই একজন সাধারণ নাগরিকের নিঃশব্দ সংগ্রামের কথা।’ আমরা যারা সাধনের উপন্যাস পড়ি, জানি, এই ঔপন্যাসিক তাঁর পাঠকদের সঙ্গে নিয়ে এগোতে চান। তাই উপন্যাসের শুতে প্রতিবেদনের মূল উপজীব্য সম্পর্কে কিছু কিছু সূত্র আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। এই ছোট বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এবং লেখক হিসেবে পাঠকের কাছে স্পষ্ট প্রত্যাশা তাঁর থাকে। তাই তিনি নেপথ্য-বাচন শেষ করেন এই বলে, ‘পরিবেশ সচেতনায় উপন্যাসটি পাঠকের কিঞ্চিৎ চেতনা-বৃদ্ধি করলে, নিজেকে ধন্য মনে করব।’

এত ছোট পরিসরে ‘বিন্দু থেকে বৃত্তে’ উপন্যাসের সব শর্ত পূরণ করেছে কি? নাকি পরিবেশ-চেতনাকে সূচনাবিন্দু করে নিয়ে বয়ান এ সময়ের ছোট-ছোট ক্ষুদ্রতা-মালিন্য-কুশ্রীতার চলচ্ছবি পেশ করেছে আমাদের কাছে! আমাদের পৌর সমাজের যে সব সমস্যা কিংবা পীড়ার অভিব্যক্তিকে আমরা নিজেদের অভ্যাসের অঙ্গ করে নিয়েছি-- তাদের আপাত-তুচ্ছতাও কীভাবে ঔপন্যাসিকতার অবলম্বন হতে পারে, সাধন তা হাতে-কলমে দেখিয়েছেন। আসলে গত তিন দশকে একটু একটু করে উপন্যাসের আখ্যান গ্রন্থনের ধরণ এতো পাল্টে গেছে যে ঔপন্যাসিকতার আদল-স্বভাব-অন্বিষ্ট কিছুই আর আগের মতো নেই। বিশেষত গত দু’তিন বছরে স্বয়ং সাধন এমন কিছু বিষয় উপন্যাসের জন্যে বেছে নিয়েছেন, যাদের মধ্যে কাহিনীকে ছাপিয়ে গেছে পরাপাঠের অকল্প। কখনও তা প্রতাপ ও প্রান্তিকায়িত বর্গের দ্বন্দ্বমথিত নব্য সাংস্কৃতিক রাজনীতি, কখনও বা রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচিত্র চিহ্নায়ন প্রকরণে ব্যক্তি-পরিসর কিংবা নারী-পরিসরের জটিল ধূপছায়া, আর কখনও কার্নিভালের উতরোল উপস্থাপনা। ‘জলতিমির’, ‘মাটির অ্যান্টেনা’ ও ‘পাল্টিপুরাণ’ নিঃসন্দেহে ঔপন্যাসিকতার নব্য গ্রন্থনায় নন্দনের নতুন মাত্রাই ব্যক্ত করেছে। ‘পিতৃভূমি’, ‘গহিনগাঙ’ ও ‘পক্ষবিপক্ষ’ এর সাধন চট্টোপাধ্যায় সময়ের দ্রুত বিবর্তনশীল অন্তঃস্বর ও পরিসরের তীব্র গ্রন্থিল অন্ধবিন্দুগুলি অনুসরণ করতে করতে বহু দূরে সরে এসেছেন। ‘বিন্দু থেকে বৃত্তে’ মূলত জীবনের বিনির্মাণপ্রবণ অনুশীলনের অন্তর্বর্তীকালীন দৃষ্টান্ত।

অন্তর্বর্তী বলছি এইজন্যে, ‘মাটির অ্যান্টেনা’ ও ‘পাল্টিপুরাণ’ এর পরস্পর ভিন্ন বয়ানের মধ্যে ঝিবীক্ষা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ছোট্ট উপন্যাসটি সেতু রচনা করেছে। যেন একদিকে গ্রামীণ পৌর সমাজের নবনির্মাণের পর্যায়ে আবহমান পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনে বিপথমান নারীঝি, অন্যদিকে নাগরিক সমাজের কোষে-কোষে সঞ্চালমান সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সমাজের বিষ ঔপন্যাসিক সবই লক্ষ করেন পরম যত্নে। কোথাও কথকসত্তার উপস্থিতি অনুভবগম্য চিহ্নায়িত বাচনের উপস্থাপনায়, আর কোথাও শ্লেষে-কৌতুকে-বিষাদে-বিবিক্তিতে কথক-সত্তা নিরপেক্ষতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ক্লিষ্ট সময় ও পরিসরে নিজের পক্ষপাতিত্ব বুঝিয়ে দেয়। খুব সূক্ষ্মভাবে এখানেই ‘বিন্দু থেকে বৃত্তে’-এর সঙ্গে ‘পাল্টিপুরাণ’এর

সুড়ঙ্গ-লালিত সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায়। পরিবেশ আন্দোলন এই উপন্যাসের আবহমন্ডল রচনা করেছে; তবে এর আধেয় কোনও এক সাধারণ নাগরিকের নিঃশব্দ সংগ্রামের কথা। এই সংগ্রামী মানুষটি ইচ্ছাপূরণের প্রতিনিধি নয়, তাকে বলা যেতে পারে মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্বে জীর্ণ এ সময়ের প্রতিনিধিল সে-সময়ে নিয়ত উপস্থিত থেকেও আমরা অনেকে যাকে ঠিক মতো চিনি না। নিতান্ত সাধারণ নাগরিকের মধ্যেও যে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে অসাধারণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা-- তাকে কেবল ঔপন্যাসিকের দ্রষ্টা চক্ষুই শনাক্ত করতে পারে।

এই ছোট্ট উপন্যাসে মানবাধিকার সম্পর্কে সাম্প্রতিক ধারণাগুলির একটি ক্ষুদ্র অথচ বিশিষ্ট দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রেই যে আমাদের ভীতা, প্রতিবাদহীনতা ও প্রতাপের কাছে আত্ম-সমর্পণের অজুহাত মাত্র--- এই ভাবনাতেই গড়ে উঠেছে 'বিন্দু থেকে বৃত্তে'র পরাপাঠ। চলমান ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কী ও কতখানি-- এই বিষয়ে কোনও তাত্ত্বিক সন্দর্ভ রচনা না করেই সাধন একে ঔপন্যাসিকতার মুখ্য অবলম্বন করে তুলেছেন। সুবিধাভোগীবর্গ এবং নানা মাপের ও ওজনের মাতববরেরা ওই চলমান ইতিহাসের দখলদারি কায়েম করতে চায়। কিন্তু ইতিহাসের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন দ্বিবাচনিকতার জোরেই কোনও এক সাধারণ মানুষ তন্দ্রাচ্ছন্ন সমাজ-সংবিদকে জাগ্রত রাখার জন্যে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে। পারস্পরিক স্বার্থের শেকলে বাঁধা পৌর ও রাজনৈতিক সমাজ ওই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে সুনজরে দেখে না, ব্যক্তিগত জেহাদ ব্যর্থতায় হারিয়ে যায়; তবু তাতে ইতিহাসের অন্তর্বৃত দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। এই ছোট্ট উপন্যাসেও অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ এই পরাপাঠ সম্পর্কে পাঠক অবহিত হতে পারেন। স্বভাবত এই উপন্যাসের পরিধি খুব বড়ো নয়, কিন্তু এর বার্তার গভীরতা অনেকখানি।

বিশ শতকের অন্তিম দিনগুলিতে নিঃশব্দে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক অস্তিত্বের অন্বয়-বিধি। পুরোনো আবরণগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, নির্যাসের ধারণাও হয়ে গেছে নিরবলম্ব। বাঙালির নাগরিক জীবনে রাজনৈতিক সমাজের অবক্ষয় নতুন নতুন জটিলতার রন্ধ্রপথ তৈরি করে দিয়েছে। নিঃশব্দে রূপান্তরিত হয়েছে ঔপন্যাসিকতার নির্মিতিও। কেউ কেউ এমনও ভেবেছেন যে বিশ শতকের পর্বে-পর্বান্তরে অভাবনীয় বৈচিত্র্য সমৃদ্ধি অর্জন করেও হঠাৎ ইতিহাসের অন্তর্ঘাতে উপন্যাসের মৃত্যু ঘটে গেছে। প্রতীচ্যের বহুমাত্রিক উপন্যাস ঝি যদিও বাংলা সাহিত্যে অলক্ষ্য গোচর, কোনও সন্দেহ নেই যে প্রাতিষ্ঠানিক উপন্যাস রচনার অভূতপূর্ব পণ্যায়ন ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও গত এক দশকে এরও অপমৃত্যু ঘটে গেছে।

সত্তর দশকের পরে বিকল্পায়ন ও অপরতার সন্ধানজনিত লিখনপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে যে বিপ্রতীপ উপন্যাস-বিশ্বের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছে, বয়ান সম্পর্কিত অতিসাম্প্রতিক নিরীক্ষার ফলে তাও পথান্তরে যাত্রার প্রতীক্ষায় রয়েছে। একটু আগে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের যে তিনটি উপন্যাসের কথা লিখেছি, তাদের এবং 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' কে ওই বিকল্পায়ন ও অপর পরিসরের সন্ধানের নিরিখে গ্রহণ করতে চাই। শেষোক্ত উপন্যাসটি, মিলান কুন্দেরার ভাষায়-- not only political or moral but ontological' (The Art of the novel : 1990 : 14). এই ছোট্ট উপন্যাসটি হয়তো অস্তিত্ববোধের উদ্ভাসনে নতুন কোনও মাত্রা যোগ করে না কিংবা জীবনসত্যের অভিনব কোন আবিষ্কারের দাবিও দানায় না। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঔপন্যাসিকতার অপ্রাতিষ্ঠানিক ধরন খুঁজে নেওয়ার জন্যে সময়-শীলিত সমাজের পরিসর সম্পর্কে আমাদের মনোযোগী করে তুলেছে।

দুই

'বিন্দু থেকে বৃত্তে'-- এই শিরোনাম থেকেই শু হয় পাঠকের বিনির্মাণ। দৈনন্দিন জীবনের আপাত-তুচ্ছ অনুপুঙ্খের গ্রন্থনায় চলমান ইতিহাসের উপাদান কীভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে, তা দেখার চোখ থাকে শুধু ঔপন্যাসিকের। বিন্দু বিন্দু জলের তাৎপর্য অনুধাবন করার প্রক্রিয়ায় আরোহী পথে তিনি পৌঁছে যান সময়-নির্ধারিত সামাজিক সত্যের আদলে। বিন্দু থেকে যাত্রা শু

করেই সামূহিক বৃত্তের ধারণায় পৌঁছে যান তিনি। মোহানায় দাঁড়িয়ে উৎসের দিকে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, প্রতিদিনকার জীবনযাপনের অনুষঙ্গেই সময়-স্বভাবের ইশারা লুকিয়ে ছিল, অথচ তাদের ঔপন্যাসিকতায় উত্তীর্ণ করার কৃৎকৌশল জানা ছিল না। চলমান ইতিহাস থেকে উপন্যাসে পৌঁছানোর পথরেখা যেন নির্দেশিত হল ৪২ পৃষ্ঠার এই বয়ানে।

কোনটা সাহিত্য আর কোনটা সাহিত্য নয় কিংবা কোনটা উপন্যাস আর কোনটা উপন্যাস নয়-- এ বিষয়ে এতদিনকার প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণাগুলি গত কয়েক বছর ধরে তীক্ষ্ম প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে। স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনের যে-সমস্ত উপকরণ জমে উঠছে কেবল-ই এবং জমতে জমতে আমাদের অভ্যাসে মিশে গিয়ে তাদের ধার হারিয়ে ফেলছে-- সেখানেই ঔপন্যাসিকতার সূচনা বিন্দু রচিত হয়ে যাচ্ছে। সাধনের 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' এই জন্যে তাৎপর্যবহ। এই প্রসঙ্গে মিখাইল বাখতিনের একটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য স্মরণ করতে পারি--

'The boundaries between fiction and non-fiction, between literature and non-literature and so forth are not laid up in heaven. Every specific situation is historical. And the ground of literature is not merely development and change within the fixed boundaries of any given definition, the boundaries themselves are constantly changing.'

নিঃসন্দেহে প্রতিটি বিশিষ্ট পরিস্থিতিই ঐতিহাসিক। তবে তাকে অনুভব করার জন্যে এবং সেই অনুভবকে পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত করার জন্যে লেখকের চাই দ্রষ্টাচক্ষু ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা। সাম্প্রতিক পশ্চিমঙ্গের সামাজিক পরিসরে যে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলেছে, তাতে রৈখিকতা নেই। তাই পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াতে মতাদর্শপুষ্ট পৌরসমাজের প্রতীতি একমাত্র সত্য নয়। ভাবাদর্শগত বিরোধিতার তীব্র আবর্ত যেমন আছে, তেমনি মতাদর্শ-অনুসৃতির মধ্যেও রয়েছে বেশ কিছু অন্ধবিন্দুর জটিল উপস্থিতি। তার মানে, সর্ষের ভেতরে ভূতের অনুপ্রবেশ অনস্বীকার্য সত্য। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানচেতনা-অর্থনৈতিক উদ্যোগ-শিল্পায়ন-স্বনিযুক্তি প্রকল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পৌরসমাজে গত পঁচিশ বছরে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটানোর কাজ অনেকটা পরিমাণে সার্থক হলেও দ্বিবাচনিকতার অমোঘ নিয়মে বহু ক্ষেত্রে সত্যভ্রম আর বিপ্রতীপতার চোরাটানও তৈরি হয়েছে।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বহু ধরনের বাধ্যবাধকতায় বন্দী বলে গণমানসের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়। অন্তর্ঘাতের দৃশ্য ও অদৃশ্য আয়োজন এতো প্রবল যে বহু সদর্থক উদ্যম এ রাজ্যে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সামাজিক অস্তিত্বে ব্যক্তিসত্তার ভূমিকা কী ও কতখানি, এ সম্পর্কে সদর্থক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস নেতিবাচক পরিস্থিতির জন্যে হারিয়ে যায়। রাজনৈতিক সমাজের মতাদর্শগত ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতাপের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র কীভাবে তাতে ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মতো নৈরাজ্য গ্রাস করে সমাজসংস্থাকে-- এই প্রক্রিয়াকে সাধন উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরেছেন। আর পরিবেশ-সচেতন একজন নাগরিকের অভিজ্ঞতার বিন্দু থেকে পৌঁছাতে চেয়েছেন সেই সময়ের বৃত্তে যা আঁধিগ্রস্ত সমাজের প্রভাবে 'out of joint'!

বয়ানের কেন্দ্রে রয়েছে সুধাময় পাল নামে ৪৫ বছর বয়স্ক একজন প্রতিবাদী মানুষ। অনেকটা রেখাচিত্র তৈরি করার ধরনে ঔপন্যাসিক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে এই মানুষটি প্রতিবাদী, আপোষের পথ ধরে হাঁটে না। ও.বি.সি তালিকাভুক্ত হয়েও বিভিন্ন সুযোগসুবিধার সামাজিক খোঁজ খবর নেয় না। প্রায় বাইশ বছর ধরে ব্যাঙ্কের কর্মচারী। কিন্তু জীবনযাপনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। স্ত্রী এবং দুই ছেলে নিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন নির্বাহ করে সে। সুধাময়ের আপাত সাধারণ অস্তিত্বের মধ্যেও যে রয়েছে অসামান্যতার ইশারা,তা লেখক আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আঠারো বছর বয়স থেকে হিমালয়ের দুর্গম ট্রেকিং বা শৃঙ্গ জয়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে সুধাময়। তার চরিত্রে ভয় নেই বলে চারদিকের অন্যায়ের সঙ্গে সে আপোষ করে না। এইজন্য পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে সে একা এগিয়ে যায় প্রতিরে

াধে। বয়ানে সুধাময়কে কথক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন সাধন। অর্থাৎ উত্তম পুষের বাচনে সমস্ত কিছুই উত্থাপিত হয়েছে। এতে ছোট পরিসরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে নিবিড় প্রত্যক্ষতা। উত্তম পুষ কথকের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে ফঁাপা ও নিরেট মানুষের মিছিল। ছোট ছোট ঘটনা কিংবা চিন্তাপ্রণালীর উল্লেখ করে ঔপন্যাসিক ওই মিছিল কথকের স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সমর-অপূর্ব-অমল-জ্যোতি গুহ-নিখিলানন্দ-সুধাময় পালদের ঘিঞ্জি পাড়া যেন পশ্চিমবঙ্গের পৌর সমাজের সংলগ্নহীন সহাবস্থানের প্রতিনিধি। উপন্যাসের শুতেই রয়েছে খুচরো নিসর্গ বর্ণনা, একটু পরেই যার ধবংস-সূত্রে পরিবেশ-সচেতন কথক-স্বর ঔপন্যাসিকতার বয়ানে মনোযোগী হবে। এর আগে 'জলতিমির' উপন্যাসে আর্সেনিক বিষে জর্জর গ্রামীণ সমাজের চমৎকার আলেখ্য করেছিলেন সাধন। দেখিয়েছিলেন, আর্থ-রাজনৈতিক পীড়নের বিদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রাম যখন প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির চোরাবালিতে হারিয়ে যায়, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক রাজনীতির অনুষঙ্গে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ সুরক্ষার সংগ্রামই হয়ে ওঠে প্রাথমিক দায়িত্ব। কায়েমী স্বার্থ পরিবেশের ভারসাম্য সম্পর্কে মাথা ঘামায় না, বরং বিশুদ্ধ আলো হাওয়া রোদ নির্বোধ ভাবে পাওয়া যে মানুষের মৌলিক অধিকার তাও হরণ করতে চায় আধিপত্যবাদের দ্বারা আশ্রিত অপশক্তিগুলি।

'জলতিমির' উপন্যাসে এই কেন্দ্রীয় উপলব্ধির বহুস্বরিক বিচ্ছুরণ লক্ষ করেছি। 'বিন্দু থেকে বৃত্তে'র বয়ানে সে ধরনের বিচ্ছুরণ নেই যদিও, পরিবেশ-চেতনাকে কেন্দ্রীয় আকল্প হিসেবে ব্যবহারের সূত্রে এই দুটি পাঠকৃতি পরস্পরের কাছাকাছি। সাধন চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে বিজ্ঞান-মনস্ক বলেই উপন্যাসের নতুন ধরণ খুঁজে নিয়েছেন বিজ্ঞানবোধের বৃহত্তর পরিমন্ডলে। বিশ শতকের অন্তিম প্রহরে আমূল পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছে যে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ অর্জনের জন্যে লড়াই এখন ইতিহাসের দুর্বিপাকে আঁধির মুখোমুখি ও দুরূহতর সংগ্রামের পর্যায়ে আপাতত গতিহীন। এ সময় আধিপত্যবাদী নিষ্ঠুরতায় আক্রান্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার পুনর্বিন্যাস করে নিতে হবে। এই হলো নতুন সময় স্বভাবের মৌলবার্তা যে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার কঠিন লড়াইয়ের কঠিনতম প্রাথমিক ধাপ হলো পৃথিবীর পরিবেশকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে অপোষহীন যুদ্ধ করে যাওয়া। এই লড়াই যতটা সংগঠনের তার চেয়েও বেশি প্রতিবাদী ব্যক্তির। একে কঠিনতর বলছি এইজন্যে যে চোখের সামনে নিজেদের পারিপার্শ্বিককে দূষিত হতে দেখলেও চক্ষুলজ্জা বা ভীতা বা কোনও গোপন স্বার্থজনিত চতুর হিসাবনিকাশের জন্যে আমরা প্রতিবাদহীন জড়পিন্ডের মতো সব ধরণের অনাচারকে মান্যতা দিই। প্রতিদিনের অভ্যাসে প্রশ্রয় পেয়ে বিদূষণ যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, শুধুমাত্র তখনই কারও কারও টনক নড়ে। কিংবা নড়েওনা আবার। 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' যেন আমাদের অনড় অভ্যাসের বিদ্ধে ঔপন্যাসিক প্রতিবাদ।

তিন

আবার, কোনও-না-কোনও ভাবে উপন্যাসের বয়ানে বহুস্বরের আভাস না থাকলেই নয়। দ্রষ্টা কথকের চোখ দিয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষজনের অনুষঙ্গে টুকরো বাস্তবকে দেখি, সেই বাস্তবের ভেতরকার নির্যাস বা নির্যাস শূন্যতাও দেখি। ছোট্ট পরিসরেও বয়ান চলমান সময়ের নানামাত্রাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে। কথকস্বরের সঙ্গে অপর পরিসরের গ্রন্থনার ধরণই গুত্বপূর্ণ। এমনকী নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই নানাস্তরের সঙ্গে দ্বিরালাপের আভাস দিয়েছে কথকস্বর। একেবারে শুতেই কথকের চোখ দিয়ে আমরা দেখি 'একটা মোরগফুল গাছ নিঃশব্দে ঝুটি ফুটিয়ে শীতের রোদ পোয়াতো নির্জনে। বেড়ায় উইমাটি ও কিছুটা লতা একসাথে খেতে দেখেছি। ভাদ্দরে কোনও গভীর রাত্তিরে ঘুম ভাঙলে, নীরব হাওয়ায় ওদিকে চোখ ছুটে গেলে দেখেছি কোণার আমলকী গাছটার ডালপাতা ঘিরে এক লক্ষ জোনাকির সোনা

লি বিজবিজ কী অপার রহস্যময়।.....সামনেই একটি কাগজি লেবুর ঝাড়। লক্ষ করেছি, গাছটাকে আশেপাশে কয়েকশো মাকড়সা নিরাপদ সংসার গড়ে স্বাভাবিক বাড়তে দেয়নি।' (পৃঃ ৭) অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষের যতখানি অধিকার, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গেরও ততখানি। জীবনের প্রতি অমেয় ভালবাসাই কথককে পরিবেশ সচেতন করে তুলেছে এবং একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য হননকারীদের বিদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

উত্তম পুষ কথক-অস্তিত্বকে রেখাচিত্রের মধ্যেও যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে তুলেছেন সাধন। নিজের সম্পর্কে সুধাময়ের ধারণা এরকম 'কঠিন, নিষ্ঠএবং বঞ্চা-মানুষ' (পৃঃ ৮)। কিন্তু সে একরৈখিক নয় 'কঠিন ও নিষ্ঠহলেও কোথাও সে স্তর-ভাঁজে আমার আবেগের ঝরোখা থাকে, বা টের পাই কখন' (তদেব)। তার ফরেস্ট-রেঞ্জার দাদা মনোময় একরোখা ও অন্যায় মেনে নিতেন না বলে চোরাশিকারী কিংবা কাঠ-ডাকাতদের হাতে খুন হয়েছিলেন। অর্থাৎ সমাজের ইতিহাস অন্যায় ও অপরাধের বিদ্ধে ধারাবাহিক লড়াইয়ের ইতিহাস। 'পূর্বসূরির শক্ত মুঠোয় ধরা প্রতিরোধের পতাকা কোনও-না-কোনও উত্তরসূরির বইতে হয়। সুধাময় কি মূলত রোমান্টিক? তাই সে ভাবে 'মৃত্যুকে আমি ডরাইনা কৃপণের মতো। হিমালয়ের দুর্গম পথে, ট্রেকিং বা শৃঙ্গ জয়ে, প্রতিবার মনে হয় শেষবারের মতো অপরূপকে দেখে নিচ্ছি।' (পৃঃ ৯) এই মানুষটি যখন চারপাশে মুখোস পরা বৃত্তবন্দী মানুষদের মধ্যে লুঠেরাদের দেখতে পায়, তার ভেতরে শৃঙ্গজয়ের দুরন্ত আবেগই জেগে ওঠে। বসুন্ধরার উদার রমণীয় ও মহিমাময় সৌন্দর্যে যে মানুষটি মুগ্ধ সে কীভাবে পার্থিব পরিবেশ বিদূষণের চত্রান্ত মেনে নেবে? মেনে নেয়নি কথকস্বর। কিন্তু প্রতিরোধে নেমে তার বোধোদয় হয়েছে যে, সবাই তার প্রতিপক্ষ। গোল মস্ত বৃত্তাকার ধরণের একটি গর্ত খোঁড়া এবং ইঁট-সুড়কি-চুনের গাথানি ধীরে ধীরে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসার মধ্যে আসলে সেই গোলকধাঁধার সূচনা দেখতে পেয়েছে সুধাময়, যাতে জড়িয়ে গেছে প্রতিবেশী-পুর প্রশাসন-রাষ্ট্রযন্ত্র-রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু সুধাময় পদে-পদে প্রতিরোধ করে যায়; নিজেই হয়ে ওঠে একক সৈন্যবাহিনী।

এ ধরনের মানুষ পর্বতশৃঙ্গের মতো নিঃসঙ্গ। তবে, এও ঠিক, এর তুলনায় অনেক নিচুতে থাকা জলাভূমির মতো মনে হয় বাকি সবাইকে। যেমন নিখিলানন্দ ও তার ছেলে নিন্টু। মাঝামাঝি শ্যামবর্ণে নিখিলানন্দকে যৌবনে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ লাগত; সে আসলে ব্যক্তি নয় বর্গেরই প্রতিনিধি। ঔপন্যাসিকের উপস্থাপনায় তা স্পষ্ট 'আদি যুগের ডাকসাইটে রাজনীতিক। পুলিশতাড়া, মানুষ খ্যাপানো, মোড়ে মোড়ে তুখোড় বক্তৃতাবাজি এবং সরকারী গোপন নথিতে বিপজ্জনক চিহ্নিত হওয়ায় চাকরি-না-পাওয়া ছিল গৌরবের ভূষণ।' (ওদের) প্রৌঢ় বয়সে পাড়ায় 'নামজাদা মানুষ' হিসেবে পরিচিত নিখিলানন্দ আরও ধূর্ত ও সুযোগসন্ধানী এবং 'আজ যাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্রে-কেন্দ্রে ছোট বড় মাঝারি-- এঁটে আছে, অনেকেরই কাছে নিখিলানন্দর অবাধ যাতায়াত।' ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করে না-লিখলেও বুঝতে পারি, অবক্ষয়িত বামপন্থী সংগঠনের দিকে ইশারা করছেন তিনি। কথকস্বরের উপলব্ধি এ সময়ের দুর্বহ ব্যাধির ফসল 'অদৃশ্য কোনও ক্ষমতার গ্লাসপানে আমরা পাড়ার মানুষগুলো নেহাৎ তুচ্ছ হয়ে গেছি এদের কাছে। অথচ, নিখিলানন্দর ছেলেরা নির্বাচনের আগে পছন্দমতো প্রার্থীদের জন্য সমর্থন আদায় করতে এসে কতই না খোশগল্প। তাহলে কি আমরা কিছু নিরীহ মানুষ ওদের কাছে কেবলমাত্র সমর্থন আদায়ের ঘুঁটি মাত্র?' (পৃঃ ১১)

নিখিলানন্দর পার্টি-রাজনৈতিক দলে আশ্রয় নিয়েছে যে জ্যোতি গুহ-- তারও মতাদর্শগত কোনও স্থিতি নেই। সমস্তই ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং স্বার্থ-সংঘাতের নিরিখে নির্ণীত হয়ে থাকে। জ্যোতির প্রচুর উপরি-আয়; তাই মহকুমা-জরিপ বিভাগে চাকরি করার ক্ষেত্রে যাতে বিপদ-আপদ না হয় এইজন্যে দপ্তরে ছোট্ট একটি ইউনিয়ন গড়ে সে পান্ডা হয়ে বসেছে। কথায়-বার্তায় চরমপন্থী; তার 'বিশেষত্বই হলো,অন্যকে 'সমালোচনার পাত্র বানিয়ে, নিজেকে সততা ও সত্যি পথের পরাকাষ্ঠা-পূজারী প্রমাণ করা।' (পৃঃ ১৪) অর্থাৎ নিখিলানন্দ ও জ্যোতি বিষ্ঠার এ পিঠ আর ও পিঠ। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। আর, সবচেয়ে মজার বোঝাপড়া। তাদের বাবারা কী রাজনীতি করে, এ সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই; এই বর্তমানজীবী তণেরা বাস করে মতাদর্শহীন লাভ-লোকসানের পৃথিবীতে। রাজনীতি-সচেতন পশ্চিমবঙ্গের পৌর সমাজে ত্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে যে সর্বাত্মক মানব দূষণ, সেদিকে গুত্ব দিয়ে সাধন পরিবেশ-ভাবনাকে বহুমাত্রিক করে

তুলেছেন।

কিন্তু শুধু দূষণকে উপন্যাসায়িত করতে চান নি সাধন। তিনি বলতে চেয়েছেন এক ব্যতিক্রমী মানুষের কথা যে স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে রক্তকরবীর মতো মাথা উঁচু গেঁথে থাকে বিভিন্ন রেঞ্জের গিরিশৃঙ্গেরা, যাদের বরফ ঢাকা বর্ণচ্ছটা মৌন ভাষায় যে মহিমা ছড়ায়, আমার প্রত্যাশা সকলের ভোক্যাল কর্ড থেকে ছিটকে ওঠা শব্দের শরীরেও যেন সেইসব রঙের ফুটকি লেগে থাকে। শব্দ তো ওই শৃঙ্গের মতই। হৃদয়ের গভীরে কোনও কুয়াশার রহস্যে লুকিয়ে থাকে।' (পৃঃ ১১) সুধাময় যে ভাষায় যে-বোধে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে আপোষহীন দৃঢ়তা প্রকাশ করে-- তা তো অন্য সকলের 'আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে' গোছের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এরা বিশ্বাস করে ইচ্ছেমতো যা-খুশি করার স্বাধীনতা ভোগ করতে। কিন্তু নিজের মুদ্রাদোষে এক শুধু আলাদা হয়ে যায় সুধাময়। কেননা নিছক 'আমার স্বাধীনতাটুকু' মেপে আলাদা করে নেয়না সে। তাই কুচক্রী প্রতিবেশী নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ' দেওয়াল গেঁথে গেঁথে আকাশচূড়ায়' তার 'বিশ্রামদৃষ্টি..... ঢালাই' করে দিলে তারশ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। সে বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখে যেন উৎকট শব্দগলিত আবর্জনার নরক তাকে গ্রাস করছে।

এই উপন্যাসে কথকস্বর আকস্মিক ভাবে প্রতিবাদী নয়। কারণ, প্রতিবেশী জীবন সাহার বাগানে পার্থেনিয়ামের ঝাড় জঙ্গল তৈরি করার পরে এর অস্বাস্থ্যকর প্রভাব নির্মূল করার জন্যে তা সাফ করতে সুধাময়ই জীবনকে বাধ্য করেছিল। তেমনি দু'বছর আগে ঠিক মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পাড়ায় দেবল বিশ্বাসের বাড়িতে কীর্তনের মাইকটা খুলিয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু সুধাময় অসামাজিক নয়, বরং গভীরতর অর্থে সমাজমনস্ক বলেই সমস্ত ধরনের দূষণের বিদ্ধে তার জেহাদ। নইলে ভিডিও প্রোজেক্টরে নতুন ফিল্ম দেখানোর জন্যে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করত না। তার চোখ দিয়ে আমরা সমাজের ভেতরকার নানা অসঙ্গতি দেখি। যেমন নিরীশ্বরবাদী অপূর্বের বাড়িতে 'দিব্যি সাজানো-গোছানো ঠাকুরের মূল্যবান সিংহাসনে ফুল-জল-ধূপকাঠি এবং নিয়মিত আচার-আচরণের লক্ষণ।' (পৃ ১৬) আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মনোজগতে এরকম বিচিত্র সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী। অনিবার্য মতাদর্শ-নিরপেক্ষতা এরং মনোজগতে বিদূষণও। স্পষ্টভাবে নয়, এই বার্তা রয়েছে ইশারায়। তবে পরিবেশ-সৈনিক স্বেচ্ছাকৃত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পরিবেশ-সুরক্ষার দায়িত্বকে গ্রহণ করেছে ওই যুদ্ধের প্রাথমিক সোপান হিসেবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউই ঝামেলায় জড়াতে চায় না। কীভাবে সুধাময় নিজেকে চক্রব্যূহের মধ্যে নিয়ে গেলো, এই বৃত্তান্তই ঔপন্যাসিকতার আধেয়। যেহেতু সুধাময়ই কথকস্বর, উত্তমপুষের বাচনে প্রতিফলিত যাবতীয় অপর পরিসরের অস্তিত্ব জুড়ে অদৃশ্য ভাষ্যকারের উপস্থিতি অনুভব করি। সাপ্লাই অফিস-ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প কার্যালয়-ঋণদাতা ব্যাঙ্ক-পুরসভা-পলিউশন বোর্ড-- সব মিলিয়ে গভীর গ্রন্থি। রাজনৈতিক সমাজের যে ধারাটি প্রতাপের খেদমতদারদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উৎসাহী, পরিবেশ দূষণ জাতীয় ছোটখাট ব্যাপার তার ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

চার

পাড়ার ভেতরে তাই দূষণের তোয়াক্কা না-করে বিনা বাধায় পিচবোর্ডের কারখানা তৈরি হতে পারে। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ জেগে ঘুমোয়, কেউ 'পি-পু ফি-শু'-র নীতিতে আস্থা রাখে। এখানে উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় ব্যক্তিসত্তার নিয়ামক অন্তঃস্বরের প্রতি তর্জনি সংকেত করেছেন সাধন। জানিয়েছেন, সুধাময় পালের ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার প্রাণভোমরা, কাজল। এ কেবল তার দাদার আদরের ডাক নয় যে, কথকস্বর ইশারায়, এভাবে জানিয়েছে 'আমার জীবনে অদৃশ্য একটি গোঁয়ার্তুমির ভূমিকা আছে। সেটি আমার মস্তিষ্কের ধূসর অঞ্চলে বাস করে না; থকথকে সাদা ভাষায় গভীরে ডুবে থাকে। পৃথিবীর কোনও ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাই না; কিন্তু একবার জেগে উঠলে তাকে দমানো বিশেষ পরিশ্রমের।' (পৃ ১৯) অস্তিত্বের নির্যাসরূপী ওই কাজলের প্রবর্তনায় একক ও অর্গম যুদ্ধে ব্রতী হয় সুধাময়। কোনও কিছুতেই যাদের কিছু আসে যায় না, সেই সব প্রতিবেশীদের কুযুক্তি (যার পাঁঠা যেমনভাবে ল্যাজে কাটুক, কি ঘাড়ে কাটুক) প্রত্যাখ্যান করতেই হয় ত

াকে। সমাজের ধারণায় যারা অন্তর্ঘাত করছে, তার যুদ্ধ তাদেরই বিদ্ধে। কেননা, 'জল-বাতাস-শব্দ-গন্ধ এখনকার যার য ার পাঁঠা নয়।' (পৃ ১৮) এভাবে সুধাময়ের প্রতিরোধ এই উপন্যাসের গন্ডি ছাড়িয়ে সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। প্রতি পদে-পদে যারা প্রতাপের কেন্দ্র উপকেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত লোভ ও ভয়ের স্নায়ু-অবশ-করা কৃৎকৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ করছে-- তাদের তন্দ্রাতুর বিবেকে আসলে কষাঘাত করেছেন ঔপন্যাসিক। সুধাময়ের অন্তঃস্থিত কাজল তো হতে পারে অ ামাদেরও জেগে-ওঠার প্রেরণা, যাতে সর্বাত্মক পরিবেশ দূষণের বিদ্ধে ঘোষণায় আমরাও পিছিয়ে না থাকি। তবে এইজন্যে নিজেকে বদলে ফেলতে হয়, এই ইঙ্গিত রয়েছে বাচনে 'যেদিন প্রথম বিশ হাজার ফুটের উঁচু একটি কুমারী শৃঙ্গ জয় করে অপার্থিব াদ ও আনন্দে চারপাশের রূপ ও মাথার ওপর নীলাভ নভোমন্ডল প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেদিন নিজেই অফুরন্ত গৌরব ও শক্তিতে মলিনমুক্ত বায়ুস্তরে একাকী চেঁচিয়েছিলাম কাজল। কা-জল। কা-জ-ল। টিমমেট মজুমদার বলেছিলেন,নিজেকে বদলে ফেলছ?' (পৃ ১৯)

নিজের অন্তঃস্বরের প্রবর্তনায় নিজেকে বদলে ফেলা যায় কিনা, এই নিয়েই সুধাময়ের নিরীক্ষা। কথকস্বর অবশ্য নিজেকে বলে 'না কেবল, উদ্দিষ্ট পাঠকদের কাছে ও মালিন্যমুক্ত বায়ুস্তরে পৌঁছানোর তাগিদ পৌঁছে দিতে চায়। আমি একক, সংখ্য াগরিষ্ঠতার অস্ত্র হাতে নেই, তবু আমি সত্য-রক্ষায় যে কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।' (পৃ ২০) এই সত্য সামাজিক সত্য, র াজনৈতিক সুবিধাবাদের দ্বারা কেটে-ছেঁটে, তৈরি কোনও মনোরঞ্জক সত্য নয়। অতএব এর দায়বোধ কঠিন ও রক্তক্ষয়ী। অথচ অদূরদর্শিতায় আক্রান্ত ও চটজলদি লাভের অঙ্কে বিশ্বাসী রাজনৈতিক সমাজ বুঝতে পারে না, ওই দায়বোধ মূলত ত ারই মতাদর্শগত উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। অন্ধদের দেশে আয়না তবে বৃথাই কী নিয়ে আসতে চায় সুধাময়? না, র াতের সবচেয়ে নিকষ-কালো প্রহরই ভোরের পূর্বমুহূর্ত, এই অমোঘ দ্বিবাচনিক সত্যে প্রত্যয়ী সুধাময় দুরূহতম পরীক্ষার মুহূর্তে নিজের ভেতরের কাজলকে 'ভবিষ্যতের পথ ঠিক করে' নেওয়ার বার্তা পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ সুধাময় ও কাজল এক াকার হয়ে গিয়ে লোভ-ভয়-সন্ত্রাসে দূষিত সমাজের শৃঙ্গ জয়ের অভিযান করে। উপন্যাসের অন্তিম বাক্য-- 'তখন রাত তৃতীয় প্রহরের পাঠকের অধিকার। ওই সীমান্তে লেখকের ভূমিকা প্রহরীর নয়। বয়ানে এতক্ষণ পর্যন্ত কথকস্বরের সঙ্গী হয়ে আমরা যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি তা থেকে সর্বব্যপ্ত দূষণের মাত্রা মেপে নিতে পারলে বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন ওই সমাপ্তিহীন উপসংহার। মুক্ত পাঠকৃতির মুক্ত সমাপ্তিই তো অনিবার্য।

সাপ্লাই অফিসের কর্মকর্তা-- পৌর প্রধানের ব্যক্তিগত সচিব -কমিশনার মৃণাল বিশ্বাস সবাই এক সুতোয় গাঁথা। তাই সুধ ামেয়র কাছে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। সে বুঝে নেয়, পর্বতারোহণের চাইতে প্রতিরোধের সংগ্রাম কম চ্য ালেঞ্জের নয়। আমাদের লক্ষ্য করতে হয় কীভাবে ঔপন্যাসিক পশ্চিম বাংলার একটি সাধারণ ঘিঞ্জি পাড়ার ঘটনাকে বি-আবহে সম্পৃক্ত করে নেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথক স্বর নিয়ে আসে জলের PH পরিমাণ অর্থাৎ জলে ক্ষার-এসিডের নির্দ্দিষ্ট ভাগ, ১০০ ডেসিবেলের ওপরে বিকট আওয়াজ, মারাত্মক গাদে মাটি নষ্ট হওয়া ও দুঃসহ পচা গন্ধ ছড়ানোর কথ া। তাই পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া দরখাস্তের বয়ানে থাকে '১৯৭২ সালে স্টকহোল্‌ম শহরে প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের সহযে াগিতায় বিশ্বপরিবেশ সম্মেলনের উল্লেখ, ১৯৯২ সালে, রিও-ডি-জেনেরিওতে বসুন্ধরা সম্মেলনের কথা এবং পরিবেশ রক্ষ ার ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত আইনের প্রসঙ্গে।' (পৃ ২৭)

কিন্তু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের আঁতাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিবাদ বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত যখন বীভৎসভাবে উলঙ্গ, নিন্টুর কাছে সুধাময়ের সমস্ত চেষ্টার খবর সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায়। প্রতিবেশীরা সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে, আমলাতান্ত্রিক কোমলীকরণ পদ্ধতি নির্বাধ হয়ে ওঠে আরও। বোর্ডের কারখানায় উৎপাদন পুরোদমে চলতে থ াকে না কেবল,নাইট শিফ্‌টেও কাজ চালু হয়। স্বভাবত শব্দ ও গন্ধের দূষণ ক্রমশ দুঃসহতর হতে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের লোক দেখানো পরিদর্শন এবং ভাড়াটে গুন্ডাদের অশ্লীল গালাগালি বিচিত্র যুগলবন্দি তৈরি করে। প্রতিবেশীরা বলে-কয়ে নিজেদের বিযুক্ত করে নেয় সুধাময়ের প্রয়াস থেকে। রাষ্ট্রশক্তি পেশীর কাছে মাথা নোয়ায় জেনেও কথক অস্তিত্ব 'ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাছে হাজির' হয়। থানার বড় দারোগা, মহকুমা পলিউশন অফিসার-- সবাই একই

দূষণ-যন্ত্রের নাটবল্টু পেরেক। সব শেষে দৃশ্যমান হয় মেঘের আড়ালে মেঘনাদের মতো অদৃশ্য পুঁজিপতির ক্ষমতাবৃত্ত। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের টিকি ওই প্রতাপকেন্দ্রে বাঁধা, নিন্টুরা এদের ফড়ে মাত্র এবং বিভিন্ন অফিসের আ ধিকারিক ও রাজনৈতিক মাতববরেরা এদের মুখোস। সমর বলে সুধাময়কে 'ছ্যাঁচড়া কিছু মাড়োয়ারি' আসলে দাদন দিয়েছে নিন্টুকে। আর, 'ও শ্রেণীর অনেক ক্ষমতা। সর্বত্র দিয়ে থুয়ে লোক ফিট রেখেছে' (পৃ ৩৮)। এরাই পচন ধরিয়েছে রাষ্ট্রে-সমাজে-পরিবারে-ব্যক্তিগত সম্পর্কে।

সুধাময়ের অন্তর্লীন প্রবর্তকতা কাজল সারারাত বুকের ধবনিতে বাজে (পৃ ৩১) এই বাচন চিহায়িত। ন্যায়ের পক্ষে লড় াইয়ের সময় তার উপস্থিতি অনুভব করে কথকস্বর (পৃ ৪১)। মহকুমা পলিউশন অফিসার এবং রাজ্য পলিউশন বোর্ডের ল-অফিসার-- দু'জনেই পুতুল মাত্র। পুঁজিবাদী লুঠেরাবর্গ দক্ষ বাজিকরের মতো তাদের নাচায়। আর বিদূষণের বিদ্ধে লড়াকু যোদ্ধা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অবস্থায় চলে আসে। আড়াই মাস তাকে হাসপাতালের নিওরোলজি বিভাগে চিকিৎসা করাতে হয়। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে মৃণাল ঝিাসের অবস্থান অনেকটা পালটে গেছে। এই অংশে (৪) ঘটন াপ্রবাহ খুব দ্রুতগতির, অন্তত প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের মন্থরতার তুলনায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দুই অবাঙালি পুঁজিপতি সরাসরি সুধাময়ের বাড়িতে এসে তাকে শাসিয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি-অংশে (৬) সুধাময়ের ভেতরে আবার কাজলের পরা-অস্তিত্ব জেগে ওঠে। এই জাগরণের সূত্রেই রৈখিকতার পিঞ্জর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো, ঔপন্যাসিকতা মুহূর্ত-বিন্দুর মধ্যে আভাসিত হলো অপরাজেয় জীবনবোধ ও সংগ্রামী প্রত্যয়ের বৃত্ত।

কথক সুধাময় এই সূত্রে 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত' নেয়, সন্ত্রাসের বিদ্ধে দাঁড়াবে সে 'একটি কঠিন শব্দের জবাব দিয়েই কাজলকে ভবিষ্যতের পথ ঠিক করে নিতে হবে' (পৃ ৪৮)। অর্থাৎ সর্বব্যাপ্ত দূষণের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, শৃঙ্গজয়ের প্রেরণায় অন্তর্দীপ্ত পথে এগিয়ে যাওয়া। গোটা সমাজ যখন পক্ষাঘাতে আচ্ছন্ন, সবার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় কথকস্বর। রাত তৃতীয় প্রহরের দিকে ঢলুক, লড়াকু মানুষের জন্যে তা ভোরের পূর্বপ্রহর। ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় বিন্দুকে নির্দেশ করেছেন, তা থেকে বৃত্তে পৌঁছানো পাঠকের দায়। সময়ের অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করেই সময়ের সম্ভাব্য উদ্‌বাসনের বৃত্তে পৌঁছানো সম্ভব। আর, তখনই কেবল পূর্ণতা পেতে পারে ঔপন্যাসিকতা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com